ক্যানসারের ফাঁদ ও মুক্তির উপায়

আলমগীর আলম

ঐতিহ্য

সেইসব মায়েদের, যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেয়ে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন কিন্তু মুখফুটে কষ্টের কথা বলতে পারেনি।

ভূমিকা

ক্যানসারের নাম শুনলেই মানুষ ভয়ে কেঁপে ওঠে, আমাদের এই পৃথিবীতে ক্যানসারের মহামারি চলছে, আমরা এই পৃথিবীর মানুষ ২০১৯ সাল থেকে একটি মহামারি পার করে এসেছি, আমরা জেনে গেছি যে আমাদের আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা কেমন! প্রলয়ে আমরা যা দেখেছি, মানুষ অসহায় হয়ে হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরেছে বাঁচার জন্য, কিন্তু ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে, বিশ্বে কোভিড-১৯-এর কারণে মোট মৃতের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৩৬ লাখ ৮০ হাজার ৬৪০। এটি সরকারিভাবে নিবন্ধিত মৃতের সংখ্যা। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে এই সংখ্যাটি প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি হতে পারে।

২০২২ সালের জুলাই মাসে, 'ইকোনমিস্ট' অনুমান করে যে বিশ্বে কোভিড-১৯-এর কারণে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখের কাছাকাছি হতে পারে। এত মানুষের মৃত্যুর বড় কারণ সঠিক চিকিৎসার অভাব। কোভিড-১৯ ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত মহামারি! বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে, ২০২২ সালে বিশ্বে ক্যানসারের কারণে প্রায় ৯.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ (৯৫ লাখ মানুষ) লোক মারা গেছে। এই সংখ্যাটি প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০৩০ সালে এটি ১০.২ মিলিয়নে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মহামারি হিসাবে এটা কি বলা যায় না যে বিশ্বে এখন ক্যানসারের মহামারি চলছে?

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২ লাখ নতুন মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় দেড় লাখ মানুষ ক্যানসারে মারা যায়। এই সংখ্যাটি প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০৩০ সালে এটি তিন লাখ নতুন রোগী এবং দুই লাখ মৃত্যু হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কেন এত মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে? এটা তো ছোঁয়াচে রোগ নয়, আজ থেকে ৫০ বছর আগে আমাদের দেশে কত মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হতো? ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ক্যানসারে মারা যাওয়ার হার প্রতি ১ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ১৭.৩ জন ছিল। আজ এই হার প্রতি ১ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ২৬.৮ জন।

যদি পরিবারের কোনো সদস্য ক্যানসারের আক্রান্ত হন, তাহলে গোটা পরিবার অর্থনৈতিক হুমকিতে পড়েন, বিশেষ করে আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে ক্যানসার চিকিৎসার ব্যয়ে মানুষ পেরে ওঠে না। অর্থ খরচ করেও যদি মানুষ বেঁচে যেত, স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারত, তাহলে একটা ভালো দিক ছিল, কিন্তু সেটা তো ঘটছে না। ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষ ব্যয়বহুল চিকিৎসা করেও বাঁচতে পারছে না। আসল কথা

হলো, বর্তমানে প্রচলিত ক্যানসারের চিকিৎসা কাজ করছে না। যার কারণে মানুষ চিকিৎসা করেও বাঁচতে পারছে না।

প্রচলিত ক্যানসারের চিকিৎসা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, নতুন ক্যানসার সৃষ্টি করে, জীবনযাত্রার মান কমে যায় এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। যার কারণে অকার্যকর ও বিপজ্জনক ব্যবস্থা দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে। আজকাল যেসব রোগী ক্যানসারে মারা যাচ্ছে, তারা ক্যানসারে নয়, বেশির ভাগ প্রচলিত ভুল (ড্রাগ) চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। বেশির ভাগ অনকোলজিস্ট পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে তাদের চিকিৎসা কাজ করে না।

ক্যানসার এখন চিকিৎসাসেবা নয়, এটা চিকিৎসা ব্যবসা! ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী ক্যানসার চিকিৎসার বাজারের আকার ছিল ২৯২.৬ বিলিয়ন ডলার। এই বাজারের আকার প্রতিবছর ৬.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০৩০ সালে এটি ৪২০.৭ বিলিয়নে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ক্যানসার চিকিৎসার বাজারের প্রধান অংশগুলো হলো

- ওষুধ : ২০২৩ সালে ওষুধের অংশটি ছিল বিশ্বব্যাপী ক্যানসার চিকিৎসার বাজারের ৬৫.২ শতাংশ। ওষুধের মধ্যে রয়েছে ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধ, যেমন কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি এবং হরমোনথেরাপি।
- থেরাপি : ২০২৩ সালে, থেরাপির অংশটি ছিল বিশ্বব্যাপী ক্যানসার চিকিৎসার বাজারের ২৫.২ শতাংশ। থেরাপির মধ্যে রয়েছে ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত থেরাপি, যেমন সার্জারি, রেডিওথেরাপি এবং ইমিউনোথেরাপি।
- যন্ত্রপাতি : ২০২৩ সালে, যন্ত্রপাতি অংশটি ছিল বিশ্বব্যাপী ক্যানসার চিকিৎসার বাজারের ৯.৬ শতাংশ। যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যেমন ইমেজিং যন্ত্রপাতি, এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান।

ক্যানসার চিকিৎসার বাজারটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। এই বাজারে অনেক বড় ওষুধ কোম্পানিগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে। এই কোম্পানিগুলো নতুন ওষুধ এবং থেরাপির বিকাশে বিনিয়োগ করছে কিন্তু মানুষের জন্য আশার কোনো বাণী নেই। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কীভাবে মানুষের মাঝে ক্যানসার হওয়ার জন্য কাজ করছে, মানুষ সুস্থ হলে সেই কোম্পানিগুলোর মুনাফা কমে যায়, তাই তাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে রোগী বাড়ানো, চিকিৎসা করানো! কোনো অবস্থায় যেন চিকিৎসার বাইরে মানুষ না থাকে। মানুষ যদি বাড়িতে বসে ফল-সবজি খেয়ে সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে সেটা তারা স্বীকার করবে না কীভাবে এই পরিস্থিতি দমন করা যায়, সেই ব্যবস্থাও তারা করবে।

গবেষণার নামে যা ঘটছে, তার মূলে রয়েছে সেই কোম্পানিগুলোর মুনাফা, তারা আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করছে রোগ নির্ণয় করা জন্য, দামি প্রযুক্তি দিয়ে রোগ নির্ণয় করে মানুষকে ফতুর করে দিচ্ছে। মানুষ তৃপ্তির ঢেকুর গিলে বলছে, তার কোলন ক্যানসার হয়েছে, কিন্তু চিকিৎসা? জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে যে চিকিৎসা করা হচ্ছে, তা যাতে কম যন্ত্রণাদায়ক হয়, তার জন্য বিস্তর অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু রোগমুক্তির ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

এই বইটিতে ক্যানসারে এই কথাগুলোই বলা হয়েছে, আমরা যে পরিবেশ-প্রতিবেশে থাকছি, তা কার্সোজোনিক হয়ে গেছে, আমাদের খাদ্য, পানি, বাতাস, ওষুধ, ঘর সবকিছুতেই প্রাকৃতিক উপাদান কমে যাচ্ছে, ক্যানসারের উপাদান বেড়ে যাচ্ছে। খাওয়াদাওয়ায় সংযম এনে ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং সুস্থ ও সুন্দর জীবন পাওয়া যায়। আমাদের দেহ নিজে ভালো থাকতে চায়, কীভাবে ভালো থাকতে হয়, তা দেহ জানে। যদি আমরা তাকে সুযোগ দিই, তাহলেই ভালো হয়ে ওঠা সহজ হয়ে উঠবে। তাই দেহকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। আমাদের কাজ হলো দেহকে যা প্রয়োজন, তা দেওয়া এবং এরপরে তার কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

কীভাবে ক্যানসার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবেন আর যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা কী উপায়ে নিজেকে সুস্থ করতে পারবেন, এই কথাগুলো বলা হয়েছে, এই বইতে তথ্য-উপাত্তগুলো বিখ্যাত লেখক রেমন্ড ফ্রান্সিসের লেখা 'নেভার ফিয়ার ক্যানসার অ্যাগেইন' থেকে নেওয়া।

এই বই লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা, ক্যানসার হওয়ার ছয়টি পথ রয়েছে, আবার সুস্থ হওয়ারও ছয়টি পথ রয়েছে। ক্যানসারের ফাঁদে যেন আমরা না পড়ি, ক্যানসার যতটা না ভয়ংকর, তার চেয়ে বেশি ভয়ংকর এর আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা!

আলমগীর আলম
খাদ্যপথ্য ও আকুপ্রেশার বিশেষজ্ঞ
প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র
https://alamgiralam.com
https://prokriti.org
01710935544

সূচি

ক্যানসারের ফাঁদ ও মুক্তির উপায় ১৩
ক্যানসার গবেষণা : একটি বিশেষ জালিয়াতি? ২০
ক্যানসারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৬
প্রচলিত চিকিৎসা ব্যর্থ ৩০
ক্যানসার পরিসংখ্যান বিভ্রান্তিকর তথ্য ৩৭
ক্যানসারের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নতুন অধ্যায়ের সূচনা ৪১
ক্যানসারকে বুঝতে হবে! ৫৮
পুষ্টির পথ ১০০
বিষাক্ত পরিবেশে বসবাস ১৬০
মানসিক সুস্থ থাকার পথ ১৯৮
দৈহিক গড়নের পথ ২০৮
ঘুম ২৩০
জেনেটিক প্রভাব ২৩৫
চিকিৎসা পথ ২৪৫
আপনার ডেন্টিস্ট যা করে থাকেন ২৬৮
সাপ্লিমেন্ট সম্পর্কে ২৭১
ক্যানসার প্রতিরোধ এবং নির্মূল করতে ২৯৮
উপসংহার ৩১৭

ক্যানসারের ফাঁদ ও মুক্তির উপায়

আলমগীর আলম

প্রতিটি মানুষ তার ভেতরে একটা ডাক্তার বহন করে। আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করা উচিত ভেতরের যে ডাক্তার থাকে, তাকে কাজ করতে দেওয়া।

—আলবার্ট শোয়েৎজার, এমডি, নোবেল বিজয়ী, মেডিকেল মিশনারি

আলবার্ট শোয়েৎজার যেমন ওপরে পরামর্শ দিয়েছেন, ঠিক তেমনই আমাদের শরীরের ভেতরের ডাক্তারকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এই বইটির উদ্দেশ্য আপনাকে তা করতে সহায়তা করা, কীভাবে আপনার শরীরের ডাক্তারকে কাজে লাগাবেন। আমরা এই বই থেকে জানব কীভাবে ক্যানসার প্রতিরোধ করা যায় এবং তাকে নির্মূল করা যায়। এখান থেকে জানব আপনাকে কী করতে হবে, কী শিখতে হবে এবং কীভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে। এখন সমস্যা হলো, আজ আমরা নানা তথ্যে এতটাই ডুবে আছি যে এর বেশির ভাগই তথ্যই দ্বন্দ্বপূর্ণ ও মিথ্যা। এমনকি সুশিক্ষিতরাও নিশ্চিত নন যে কোনটা বিশ্বাস করবেন, কোনটা করবেন না। মানুষ হারিয়ে গেছে বিভ্রান্ত তথ্যের নিচে ও হতাশায়। আমার লক্ষ্য হলো বিভ্রান্তি কাটানো এবং সেই তথ্যটিকে ব্যবহারিক জ্ঞানে পরিণত করা, যাতে আপনি আপনার স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণ নিজে নিতে পারেন।

আলবার্ট শোয়েৎজারের জীবনে একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮৫ সালে এবং তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন। তিনি অবসাদ ও অ্যালার্জিতে বেশ কিছুদিন ধরে ভুগছিলেন। চিকিৎসকেরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিপর্যয়কর কিছু ভুল নির্ণয় করেন এবং ভুলের সিরিজ চিকিৎসায় তাঁর লিভার বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ গ্রহণের কারণে লিভার ফেইলিউর হয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। অবস্থার এমন অবনতি হয়েছিল যে একটি মানবকঙ্কাল হয়ে পড়েছিলেন তিনি এবং চিকিৎসকেরা বলেছিলেন, তাঁর জন্য আর কিছুই করার নেই। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর জীবন বাঁচাতে জৈবরসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন। সেই সময় তাঁর কাছে ঘটে যাওয়া ভুল চিকিৎসা একটি

দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল। সেখান থেকে তিনি নিজেকে বাঁচাতে যা করেছিলেন, তা তিনি অন্যদের শেখানোর একটি প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

৪৮ বছর বয়সে, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে এবং স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে দুই বছরের অধ্যয়ন ও কঠোর পরিশ্রম লেগেছিল তাঁর। সেই সময় কীভাবে সুস্থ হয়েছিলেন তিনি এবং অন্যরা কীভাবে ভালো থাকতে পারেন, সে সম্পর্কে আশ্চর্যজনক কিছু বিষয় আবিষ্কার করেছিলেন, যা তাঁকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে অসাধারণভাবে বেঁচে থাকার দিকে নিয়ে গেছে। আজ, ৭২ বছর বয়সে, আলবার্ট শোয়েৎজারের সীমাহীন শক্তি, একটি পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে সুস্থ আছেন এবং তার পর থেকে কখনোই অসুস্থ হননি (গত ২৪ বছরে শুধু একবার সর্দি হয়েছিল)। ধমনির জৈবিক বয়সকে ২০ বছর বয়সী এক তরুণের বয়সে নামিয়ে এনেছেন এবং তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল যখন তাঁর বয়স ৮০ হবে, তখন তাঁর ধমনির বয়স হবে টিনএজারের বয়সী। এটি একটি সত্যিকারের আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা যে সারা বিশ্বের মানুষকে কীভাবে সুস্থ হতে হয় এবং সুস্থ থাকতে হয়, তা শিখতে সাহায্য করা এবং তিনি এই বইয়ের মাধ্যমে কীভাবে দুরারোগ্য রোগ ক্যানসার থেকে উত্তরণ পাওয়া যায়, সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চেয়েছেন।

তিনি একজন রসায়নবিদ ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) স্নাতক। তিনি তাঁর অসুস্থ হওয়ার পেছনের রহস্যটা উদ্‌ঘাটনের জন্য বিজ্ঞানের ভেতরে প্রবেশ করেন। কোষস্তরে তাঁর সমস্যাগুলো বোঝার মাধ্যমে তিনি শিখেছেন আমরা কীভাবে নিজে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো নিজেরা তৈরি করে চলছি, আমাদের দুর্বল পছন্দের মাধ্যমে কয়েক দশক ধরে করে আসছি। তাঁর স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে ছিল দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি, চরম রাসায়নিক সংবেদনশীলতা, প্রায় সবকিছুতে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া, লুপাস, হাশিমোটোর থাইরয়েডাইটিস, সিজোফ্রেনিয়া সিনড্রোম, ফাইব্রোমায়ালজিয়া, দৃষ্টি সমস্যা, হজমের সমস্যা, ত্বকে ফুসকুড়ি, মাথাব্যথা, ব্রেন ফগ, মাথা ঘোরা এবং গ্র্যান্ড ম্যাল সিজার।

সৌভাগ্যবশত, আমরা খুঁজে পেয়েছি যে খাওয়াদাওয়ায় সংযম এনে ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং সুস্থ ও সুন্দর জীবন পাওয়া যায়। আমাদের দেহ নিজে ভালো থাকতে চায়, কীভাবে ভালো থাকতে হয়, তা দেহ জানে। যদি আমরা তাকে সুযোগ দিই, তাহলেই ভালো হয়ে ওঠা সহজ হয়ে উঠবে। তাই দেহকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। আমাদের কাজ হলো দেহের যা প্রয়োজন তা দেওয়া এবং এরপর তার কাজে হস্তক্ষেপ না করা। দুর্ভাগ্যবশত, অল্পসংখ্যক চিকিৎসক জানেন কীভাবে এটি করতে হয়, আমাদের দেশের চিকিৎসকেরাও জানেন কিন্তু তাঁরা

বলেন না। তাঁরা ওষুধ কোম্পানির লাভের ফাঁদে পড়ে মানুষের শারীরিক উন্নতি জন্য ওষুধ দিয়ে থাকেন, কিন্তু এই ওষুধ আমাদের উন্নতির চেয়ে অবনতিই করে বেশি।

আলবার্ট শোয়েৎজার যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে চিকিৎসকেরা তাঁকে সুস্থ করবেন, কিন্তু চিকিৎসকদের ভুলে তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, চিকিৎসকেরা এর চেয়ে ভালো জানতেন না! এই ভালো মানে, এই চিকিৎসকেরা ছিলেন আশাতীতভাবে সেকেলে, তাঁদের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি শেখানো হয়েছিল। আমাদের চিকিৎসকেরা শিখেছেন যে ওষুধ ও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই রোগ সারাতে হয়। তাঁদের স্বাস্থ্যের একটি 'রোগ-যত্ন' মডেল শেখানো হয়, যা রোগ প্রতিরোধ বা নিরাময় করতে অক্ষম। আসল উত্তর হলো, দেহের কোষগুলোকে তাদের কাজ করতে দেওয়া এবং তারা দেহ থেকে বিষ হ্রাস করতে পারে।

প্রচলিত ওষুধ রোগ প্রতিরোধ করে না; রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরই এটি কার্যকর হয়। এরপর রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে এটি শুধু লক্ষণগুলোকে দূর করার চেষ্টা করে, কিন্তু যে কারণে রোগে লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সেগুলোকে ঠিক করার কার্যকর কোনো কাজ করে না। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ আর সুস্থ হয়ে ওঠে না। যার কারণে বিপুল টাকা খরচ করেও মানুষ সুস্থ হয় না। বস্তুত আমাদের স্বাস্থ্যসেবায় কোনো শিল্প নেই, আছে শুধু আমাদের একটি 'রোগশিল্প', যা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল লাখ লাখ অসুস্থ মানুষের অর্থের ওপর। লাখ লাখ মানুষ অসুস্থ হচ্ছে এবং বিপুল অর্থ খরচ করেও অসুস্থ থাকছে মৃত্যু পর্যন্ত। দুর্ভাগ্যবশত, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এই অকার্যকর, ব্যয়বহুল এবং বিপজ্জনক পদ্ধতি আমাদের সমাজের আদর্শ, আমরা আর অন্য কিছু ভাবতে পারি না, আমাদের ভাবতে দেওয়া হয় না। মানুষকে অসুস্থ রাখার মতো খারাপ ব্যবসা হতে পারে না, কিন্তু আমাদের কাছে সেটা বৈধ এবং উচ্চ আদর্শিক। মানুষ জানে যে তাকে কতটা ক্ষতি করে, তবু গতানুগতিক চিকিৎসার প্রতি মানুষ অনেকটাই মোহগ্রস্ত! চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করার কারণে মানুষ বেশি রোগে আক্রান্ত থাকছে, সেই সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। খোদ আমেরিকার মতো দেশেও এ কারণে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে।

মানুষ তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু আধুনিক মানুষ তার চারপাশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে যে তার কাছে রোগ হওয়া ছাড়া ভালো থাকার উপায়গুলো এখন আর হাজির থাকে না। নানা গোষ্ঠীর মধ্যে নানা উপায়ে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষ এখন সুস্থ থাকার পরামর্শের জন্য ভালো কিছু খুঁজতে শুরু করেছে। স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে আমাদের নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সব ধরনের সমস্যায় ভুগছেন,

এমন মানুষ তাঁদের রোগগুলো থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করতে শুরু করেছেন। এই বইয়ের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা যা বুঝতে পেরেছি, তা হলো আপনার স্বাস্থ্য সমস্যা কী, তা বিবেচ্য নয়, আপনার কাছে সত্যিই একটিই উপায় আছে সুস্থ হয়ে ওঠার! আর এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে আপনার সুস্থ হওয়ার সেরা উপায় হলো আপনার ভেতরের ডাক্তারকে কাজ করতে দেওয়া।

আলবার্ট শোয়েৎজার কতজন গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ হতে সাহায্য করেছেন, সেটা একটি দেখার বিষয়। তিনি তাঁর নতুন জ্ঞান অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়েছেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন পর্যায়ে হলেও তিনি শত শত 'নিরাময়যোগ্য' ক্যানসার রোগীকে সুস্থ করতে সফল হয়েছেন।

উদাহরণ হিসেবে লে রয় নামের একজন ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা-অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা যেতে পারে।

২০০৫ সালে, লে রয় নন-হজকিন্স লিম্ফোমায় আক্রান্ত হন এবং আট মাস কেমোথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা করিয়েছেন। এতে দেখা যায় যে কেমোথেরাপির মাধ্যমে তিনি ক্যানসারমুক্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেমোথেরাপি দেওয়ার পরও কিছুদিনের মধ্যেই যথারীতি ক্যানসার পুনরায় ফিরে এসেছে। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে, তাঁকে মায়ো ক্লিনিকে পাঠানো হয়েছিল, যেখানে তাঁর ১২টি বায়োপসি এবং তিনটি পিইটি (পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফি) স্ক্যান করা হয়েছিল। চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেছেন যে লিম্ফোমা তাঁর ঘাড়ের সঙ্গে বুকে এবং তাঁর পেটে একটি বড় ক্ষত নিয়ে ফিরে এসেছে। তখন চিকিৎসকেরা তাঁকে আবার কেমোথেরাপি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

লে রয় জানতেন যে একাধিক মেটাস্ট্যাসিসের সঙ্গে তাঁর পরিস্থিতি গুরুতর এবং এ সময়ের মধ্যে তিনি শিখেছিলেন যে প্রচলিত ওষুধ তাকে বাঁচাতে পারবে না। তাই তিনি বিকল্প খুঁজতে থাকেন। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে লে রয় যুক্তরাষ্ট্রের রসায়নবিদ রেমন্ড ফ্রান্সিসের লেখা বই 'নেভার বি সিক অ্যাগেইন'-এর একটি কপি কিনেছিলেন। তিনি সেই বই পড়ে নিজেকে আমূল পরিবর্তন করে ফেলেন। তিনি তাঁর খাদ্য পরিবর্তন করেন এবং সাপ্লিমেন্টনির্ভর একটি উপায় খুঁজে বের করেন। তিনি রেমন্ড ফ্রান্সিসের নির্দেশনার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিলেন এবং প্রতিদিন প্রায় ৪০টি বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট ও প্রাকৃতিক খাবার গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। দুই মাসে (মার্চে) লে রয় ভালো বোধ করতে শুরু করেন এবং তিনি বুঝতে শুরু করেন যে তাঁর শরীরে ভালো কিছু ঘটছে। জুলাই মাসে তাঁর আরেকবার পিইটি স্ক্যান করা হয়েছিল এবং চিকিৎসকেরা তাঁর ফলগুলো দেখে বিশ্বাস করতে পারেননি :

* তাঁর ঘাড়ের ক্ষত উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট হয়ে গেছে।
* তাঁর বুকের ক্ষত অদৃশ্য হয়ে গেছে।
* তাঁর পেটের বড় ক্ষতটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।